পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

বিশ্বজিৎ আঁকুড়ে শিক্ষক
ইছাপুর এন. সি. হাই স্কুল

মনোসংযোগ বাড়াতে হবে

একটা ছাত্রকে প্রথমেই নিজেকে চিনতে হবে। অর্থাৎ আমি কে, কী করছি কেন করছি? এই তিনটে প্রশ্নের ওপরেই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ। শিক্ষার্থীকে নিয়মিত যে কাজটি করতে হবে সেটা হল স্কুলে যা পড়ানো হচ্ছে বাড়িতে এসে তার চর্চা করা। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মনোসংযোগ। প্রয়োজনে তার জন্য প্রাণায়াম করতে হবে। কোনও শিক্ষার্থী যখন কোনও বিষয় পড়বে তখন তাকে এটা মনে রাখতে হবে, যে সে যে বিষয়টা পড়ছে বা শিখছে সেটা যেন অন্য কাউকে পড়াতে বা শেখাতে পারে। এতে বিষয় সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে এবং বিষয়টি আরও ভালো আত্মস্থ হবে। এখনকার সময়ে গ্রুপ স্টাডি খুব জরুরি। যে ছাত্র বা ছাত্রী তুলনামূলক যে বিষয়ে ভালো সে সেই বিষয় বা টপিক তার বন্ধুকে বোঝাবে। এতে নিজের ভুল বা দুর্বলতাগুলো খুব সহজেই ধরা পড়বে। আর ঠিকঠাক পড়াশোনার জন্য দরকার একটা নির্দিষ্ট রুটিন যেটা শিক্ষার্থী তার মতো করেই বানাবে। প্রত্যেকটি বিষয়ই নিয়ম করে পড়তে হবে। এখনকার প্রশ্নের ধরন হল এমসিকিউ টাইপ। তাই নোট বা সাজেশন নয় টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। তাহলেই সাফল্য আসবে। আর একটা ব্যাপার হল একনাগাড়ে বই নিয়ে বসে থাকা মানেই কিন্তু পড়াশোনা নয়। তাই অনেকক্ষণ পড়তে পড়তে যদি একঘেয়ে লাগে তবে একটু গান শোনা বা গল্পের বই পড়া যেতে পারে। পড়াকে যেন কখনওই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমনটা মনে না হয়। ভালো রেজাল্ট করতে গেলে তাগিদটা ছাত্রের ভেতর থেকেই আসতে হবে।

সন্তানের বন্ধু হয়ে উঠতে হবে

পৃথিবীর সব চাইতে কঠিনতম কাজ বোধহয় একজন সন্তান জন্মানোর পর সেই সন্তানকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার পর থেকেই একজন অভিভাবক এটাই ভাবতে থাকেন তাদের একজন প্রকৃত ভালো বাবা-মা হয়ে উঠতে হবে, না হলে সমাজ তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। একজন অভিভাবক মনেপ্রাণে চান, তাঁদের ভালোবাসা ও আদরে লালিত-পালিত সন্তান যেন সব দিক দিয়ে খুব ভালোভাবে মানুষ হয়ে উঠতে পারে। সন্তান একটু বড় হতে না হতেই তাকে সব দিক থেকে সফল দেখতে চান। অন্যদের থেকে তাদের সন্তান যাতে সব বিষয় এগিয়ে থাকতে পারে তার জন্যও কোনও খামতি রাখেন না। আর এই কাজটাই অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে করতে গিয়ে অনেক সময়ে অভিভাবকেরা নিজের আদরের সন্তানের সঙ্গে এমন আচরণ করে বসেন যে সন্তানের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়।

অনেক বাবা-মা আছেন যাঁরা সন্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া পছন্দ করেন না। ফলে বিভিন্ন কারণে সন্তান মানসিক সমস্যায় ভোগে। গবেষণায় দেখা গেছে এই ধরনের সন্তানরা প্রায়শই আত্মবিশ্বাস এবং অপর্যাপ্ত আত্মসম্মানবোধে ভুগছে। অনেক সময়েই একজন অভিভাবককে বলতে শোনা যায়, তাদের আমলে সবকিছু খুব ভালো ছিল, কিন্তু বর্তমানে সবকিছু খুব খারাপ। এতে একজন সন্তান ও বাবা-মায়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। সন্তানরা যাই করতে যাক না কেন, অভিভাবকরা সব সময় সেই কাজের সমালোচনা করলে সন্তানদের মধ্যে একরকম আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। আর এর থেকেই সন্তানের মনে হতে পারে সে কোনও কাজের যোগ্য নয়, বা কোনও কাজ করতে পারবে না। পরবর্তীকালে এই ধরনের আত্মবিশ্বাসের অভাব তার জীবনের বিভিন্ন দিকে অহেতুক সমস্যা তৈরি করে। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি বাবা-মা একজন বন্ধুর মতো তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন তাহলে সমস্যা তৈরি হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকরা এই কাজটি করেন না। অন্যদিকে যে সকল অভিভাবকেরা নিজের সন্তানদের স্বাধীন ভাবে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ দেন, তাঁদের সন্তানরা জীবনের যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। নিজেদের মতো করে যারা বড় হতে পেরেছে, তারা ইঁদুর দৌড়ের চাপও অনেকটাই সহজ করে নিতে পারে।

পড়াশোনার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত চাপ দেওয়া ঠিক নয়। অন্যের সঙ্গে তুলনা করা মানে সন্তানকে কষ্ট দেওয়া। অনেক সময় দেখা যায় একজন সন্তানের পরীক্ষার রেজাল্ট খুব খারাপ হলে তার বাবা-মা স্কুলের মধ্যে অন্যান্য বন্ধুদের সামনেই তাকে অযথা মারধর বা বকাবকি শুরু করেন। যেটি শিশু মনে খুব বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। সম্মান সকলের আছে, ছোট বলে সম্মান নেই এমনটা নয়।

জন্ম থেকে একজন সন্তানের সুস্থভাবে বড় করে তুলতে গিয়ে অনেক সময় একজন অভিভাবককে হয়তো নিজের কেরিয়ার বলিদান দিতে হয়। একজন সন্তানকে বড় করে তোলার পিছনে একজন বাবা-মায়ের অনেক কষ্ট এবং পরিশ্রম থাকে। সেটি খুব সত্যি। এরফলে সন্তানের কাছ থেকে আশাও ক্রমশ বাড়তে বাড়তে আকাশচুম্বী হয়ে যায়। একজন অভিভাবক অনেক সময়ে মনে করে তিনি যা ঠিক করবেন সন্তানের জন্য সেটাই ঠিক। তাদের মতামত নিয়ে কাজ করার কোনও দরকার নেই। কিন্তু এখানে একজন অভিভাবকের বোঝা উচিত প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্বতা আছে, তাই সেগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। *এরপর দুয়ের পাতায়*

জেনারেল নলেজ: দুই, ছয় ও আটের পাতায় || স্পেশাল টিউশন: তিনের পাতায়
ক্লাস (সেভেন-টেন) টিউশন: চার ও পাঁচের পাতায় || ক্যুইজ: সাতের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

শ্রেষ্ঠা সামন্ত অষ্টম শ্রেণি, বেহালা কিশোর ভারতী গার্লস হাইস্কুল

মন দিয়ে পড়লে টিউশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই

ঘড়ি ধরে পড়াশোনা করার অভ্যাস না থাকলেও, পড়তে বসলে মন দিয়ে পড়াশোনা করা উচিত বলে মনে করে বেহালা কিশোরভারতী গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেষ্ঠা সামন্ত। সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে শ্রেষ্ঠা। অবশ্য পঞ্চম শ্রেণি থেকেই প্রথম স্থানের রেকর্ড তার ঝুলিতে। আলাদা করে টিউশন নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না শ্রেষ্ঠা।

উত্তরণ: স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ফিরে কতক্ষণ পড়াশোনার সময় পাও?

শ্রেষ্ঠা: বাড়িতে আমি পড়াশোনার যথেষ্ট সময় পাই। পড়াশোনার বিষয়ে স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাই। বাড়িতে গিয়ে সেই বিষয়গুলি খুব মন দিয়ে পড়ি। যেহেতু আলাদা টিউশন নিই না তাই হাতে সময়ও বেশি থাকে।

উত্তরণ: তুমি কি মনে করো টিউশন নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই?

শ্রেষ্ঠা: স্কুলের শিক্ষিকারা আমাদের যেভাবে পড়ান তারপর বাড়িতে এসে ভালো করে পড়ে নিলে হয়ে যায়।

উত্তরণ: ভালো রেজাল্ট করার জন্য কী করো?

শ্রেষ্ঠা: আমি যখনই যে বিষয়া পড়ি, মন দিয়ে পড়ি। শিক্ষিকাদের দেওয়া নোটস ও পাঠ্যবই দুটোই আমি খুব মন দিয়ে অভ্যাস করি।

উত্তরণ: পড়াশোনার বিষয়ে বন্ধুদের কিছু বলতে চাও?

শ্রেষ্ঠা: কোনও বিষয় পড়লে সেটা মন দিয়ে পড়া উচিত। পড়ার পর লিখে অভ্যাস করলে পড়াটা ভালো মনে থাকে। মন দিয়ে পড়লে যেটা পড়ছি সেটা খুব সহজেই পড়া হয়ে যায়।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

শ্রেষ্ঠা: অঙ্ক।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

শ্রেষ্ঠা: আইনজীবী।

উত্তরণ: হঠাৎ কেন আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছে হল? বিশেষ কোনও কারণ আছে?

শ্রেষ্ঠা: সমাজের কিছু জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে। আইনজীবী হতে পারলে সেইগুলো নিয়ে লড়াই করতে পারব।

উত্তরণ: সমাজের কোন বিষয়টা তোমার খারাপ লাগে?

শ্রেষ্ঠা: মেয়েদের নিরাপত্তা।

উত্তরণ: অবসর সময়ে কী করো?

শ্রেষ্ঠা: গল্পের বই পড়ি। রহস্য উপন্যাস পড়তে বেশি ভালো লাগে। খবরের কাগজ পড়ি। টিভিতে নিউজ চ্যানেলগুলো দেখি।

উত্তরণ: তোমার অনুপ্রেরণা কে?

শ্রেষ্ঠা: বাবা-মা ও শিক্ষিকারা।

উত্তরণ: ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি আরও সফল হও এই কামনা করি।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team

উত্তরণ

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, বিদিশা চক্রবর্তী**

জেনে রাখো

আফ্রিকাতেও বাংলা ভাষা ‘সরকারি ভাষা’ হিসাবে স্বীকৃত

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা বলতে বা বাংলায় লিখতেই আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করি। আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষার একটা আধিপত্য থাকলেও আমাদের কাছে বাংলা ভাষাই শ্রেষ্ঠ ভাষা।

আমাদের দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় ভাষাও কিন্তু বাংলা। বাংলা ভাষা নিয়ে এই কথাগুলো বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আফ্রিকার একটি দেশের অন্যতম সরকারি ভাষা হল বাংলা। সেই দেশের নাম হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। বিষয়টাও হয়তো অজানা।

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী একটি দেশ হল সিয়েরা লিওন। এই দেশটির বিশেষত্ব হল পৃথিবীর বৃহত্তম টাইটানিয়াম এবং বক্সাইট উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। শুধু তাই নয় সোনা এবং হিরে উৎপাদনেও এগিয়ে রয়েছে সিয়েরা লিওন। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরের এই দেশেরই অন্যতম সরকারি ভাষা হল বাংলা। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই কিন্তু সত্যি। তবে এই বিষয়টা জানার পর হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা নিশ্চয়ই বাংলাতেই কথা বলেন। কিন্তু সেরকম কিছু নয়। এর পিছনেও একটি কারণ রয়েছে।

আর সেই কারণ জানতে হলে একটু অতীত ঘাটতে হবে। ১৯৬১ সালে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে এই দেশটি মুক্তি পায়। স্বাধীনতার ৩০ বছরের মাথায়, ১৯৯১ সালে, প্রবল দুর্নীতি এবং দেশের সম্পদ নষ্ট হওয়ার প্রতিবাদে এই দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধ চলে ছিল ২০০২ সাল পর্যন্ত। ক্রমশ পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে থাকলে গৃহযুদ্ধ থামাতেই হস্তক্ষেপ করে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং এই পর্যায়েই রাষ্ট্রপুঞ্জের পিসকর্পের প্রতিনিধি হিসাবে সিয়েরা লিওনে প্রায় ৫৩০০ বাংলাদেশি সৈনিক আসেন। পিসকর্পের অবদানেই শেষ পর্যন্ত সিয়েরা লিওনে শান্তি ফিরে আসে এবং এই অবদানের স্বীকৃতি হিসাবেই সেদেশের রাষ্ট্রপতি আলহাজ আহমেদ তেজান কাবাহ ‘বাংলা’ ভাষাকে সিয়েরা লিওনের ‘সরকারি ভাষা’ হিসাবে ঘোষণা করেন। তারপর থেকেই

আফ্রিকার ওই দেশটিতে অন্যতম সরকারি ভাষা হল বাংলা। ভাবতেও অবাক লাগে। আফ্রিকার মতো একটা দেশে কোনও না কোনও সময় কেউ না কেউ বাংলা ভাষাতে কথা বলত। আর শুধু নয় সেখানে আমাদেরই মাতৃভাষা সরকারি ভাষার স্বীকৃতিও অর্জন করেছে। যেখানকার মানুষদের আদিবাসী বলা হয়। যে আদিবাসী মানুষের ভাষাও আমাদের বোধগম্য নয়। সেরকমই একটি দেশে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে এমনই একটি অজানা বিষয় আমাদের হয়তো অনেকেরই জানা ছিল না। বাঙালি হিসাবে এটা বেশ গর্বের তাই নয় কি? গোটা বিশ্বে কত কিছু আজও আমাদের অজানা থেকে গিয়েছে।

জেনে রাখো

ইংরেজি থেকে বাংলায় তারিখ নির্ধারণ করার উপায়

অনেক সময় বাংলার তারিখ আমাদের মনে থাকে না। কোনও স্বনামধন্য মানুষের জন্ম তারিখ আমরা ঠিক সময়ে মনে করে বলতে পারি না। এর ফলে আমরা বিভিন্ন সময়ে অনেকের সামনেই লজ্জাই পড়ে যাই। আসলে বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই কিছু কিছু জিনিস ইংরেজি ভাষায় মনে রাখতে পছন্দ করেন। তাদের মতে ইংরেজিতে মনে রাখা সহজ। তবে বিষয়টি ইংরেজি ও বাংলা ভাষার মধ্যে কোনও রকম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা নয়, কীভাবে বাংলা ভাষায় তারিখ মনে রাখা সম্ভব সেটাই আলোচ্য বিষয়। প্রথমে ইংরেজি সন থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করে বাংলা সন বের করে নিতে হবে। বাংলা ১লা বৈশাখ সব সময় ইংরেজির এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখ থেকে শুরু হয় এবং বাংলায় অন্যান্য

মাসগুলি পর্যায়ক্রমে ইংরেজি মাসের ১৩ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যেই শুরু হয়।

যেহেতু ইংরেজি মাসের ১৩-১৬ তারিখের মধ্যে বাংলা মাসগুলির ১ তারিখ শুরু হয় তাই নীচের কোডটি মনে রাখতে পারলেই আর কোনও সমস্যা নেই।

কোড: ৪ ৫৫ ৬৬৬৬ ৫৫ ৪৩৫।

এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলার ১২ মাসের ১২টি কোড আছে।

কোডটিতে ৪ মানে ইংরেজি মাসের ১৪ তারিখ, ৫ মানে ইংরেজি মাসের ১৫ তারিখ, ৬ মানে ইংরেজি মাসের ১৬ তারিখ এইভাবে যা বাংলা মাসগুলির ১ম তারিখ পর্যায়ক্রমে শুরু হওয়া নির্দেশ করে।

যেমন: কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে। এটাকে বাংলা সন-তারিখে রূপান্তরিত করতে হলে ১৮৯৯ থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে ১৩০৬, বাংলার এই সালেই কাজি নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এবার ২৫ মে থেকে বাংলা মাসের তারিখটি বের করতে হলে

কোডের ১ম অঙ্কটি ৪, মানে এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখ বা বাংলার ১ লা বৈশাখ। কোডের ২য় অঙ্কটি ৫, মানে মে মাসের ১৫ তারিখ বা বাংলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা তারিখ। এখন, ১৫ মে থেকে ২৫ মে মানে ১১ দিন।

অর্থাৎ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

সুতরাং, কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ইংরেজির ১৮৯৯ সালের ২৫ মে হচ্ছে বাংলায় ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

এই পদ্ধতিতে সকলের পক্ষে বাংলার তারিখ বের করা সহজ হবে। তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

সন্তানের বন্ধু হয়ে উঠতে হবে

প্রথম পাতার পর

কোনও কাজে সন্তানের মতামত নিলে একজন অভিভাবকের সম্মানহানি হওয়ার কিছু ব্যাপার নেই, উলটে একজন সন্তান নিজেকে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি বলে ভাববে। তবে যদি তাদের মতামত ঠিক না হয়, সেক্ষেত্রে একজন অভিভাবককে ভালোভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কেন তার মত গ্রহণযোগ্য হল না। এর ফলে যে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তার কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়বে।

অনেক সময়ে একজন অভিভাবক সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়েও সমালোচনা করে থাকেন। যেমন, তাদের সময় এই ধরনের জামা তাঁরা পরতেন না, এখন পোশাকগুলো খুব খারাপ ধরনের। এই রকম কথা না বলে কোথায় কোন পোশাক মানানসই সেটা বুঝিয়ে দেন তাহলে ভালো হয়।

সন্তানদের জীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে থাকা মন্দ নয় কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা সেটি ঠিক কাজ নয়। এর ফলে সন্তানের মধ্যে সহজেই অবসাদ এবং উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। একজন সন্তান যখন ছোট থেকে যখন বড় হয়, তখন তাদের জীবনে নানা রকম শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হতে শুরু করে। অনেক ঘটনাই সে তার বাবা-মাকে এসে সরলতার সঙ্গে বলে। স্কুলে বা রাস্তায় ঘটা কোনও ঘটনা সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে শেয়ার করে। এমন কোনও ঘটনা হয়তো বাবা-মায়ের পছন্দ নয় সেইরকম কোনও ঘটনার কথা শুনলে বাবা-মা সব ভুলে গিয়ে অযথা চিৎকার-চেঁচামেচি করতে শুরু করেন। ফলে বাবা-মা নিজের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনেন। কারণ সন্তান বাবা-মা-এর কাছ থেকে বকা খেয়ে ওই কাজগুলি আর করবে না এমন নয়, কিন্তু যে কথাটি সে তার বাবা-মাকে বলে করছিল এবার সে ওই কাজটি লুকিয়ে করবে। আর নিজের বিপদও নিজেই ডেকে আনবে। আর এর পর থেকেই বাইরের তৃতীয় কোনও ব্যক্তির ওপরে এই সময় একজন সন্তান নির্ভর করতে শুরু করে। তার বন্ধুত্ব অনেক সময়ে ভালো হতে পারে আবার তাকে বিপথে টেনে নিয়েও যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাবা-মা যদি তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করে থাকেন সেক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয় না। একজন অভিভাবকের উচিত মাঝেমধ্যে সন্তানের বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা। আপনি জানতে পারবেন সে কী ধরনের বন্ধুদের সঙ্গে ওঠাবসা করে।

অনেক সময়ে বাবা-মা ছেলে-মেয়েদের পাশে বসে মোবাইল দেখতে থাকেন বা নেট সার্ফ করতে থাকে। এই ধরনের কাজ শিশুমনে অযথা ইচ্ছের জন্ম দেয়। পাশাপাশি যে কোনও সময়ে টিভি দেখা এই সমস্ত ব্যাপারেও বাবা-মায়ের অহেতুক প্রশ্রয় থাকে। সন্তানকে ছোট থেকেই নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা শেখানো উচিত। বাবা-মাকেও তাদের সামনে সেই নিয়মানুবর্তিতা দেখানো উচিত। অর্থাৎ নিজে যে কাজটি করব সেই কাজটিই আমি করার নির্দেশ দেব। একটি শিশু যখন ছোট থেকে বড় হয়, তাকে সহমর্মিতা, ভালোবাসা, স্নেহ, আদর এই সমস্ত কিছু দিয়েই বড় করা উচিত। অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় যেমন তাদের জীবনে ক্ষতি ডেকে আনে তেমনি অতিরিক্ত শাসন ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তাদের জীবনে বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই একজন বাবা-মাকে সংবেদশীলতার পাশাপাশি সমস্ত রকম পরিস্থিতি বুদ্ধি দিয়ে মোকাবিলা করা উচিত। সেইসঙ্গে অভিভাবকদের উচিত সন্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করা।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: কম্পিউটার

মাইক্রোসফট এক্সেল

Status bar কী?

ওয়ার্কবুক উইন্ডোর সর্বনিম্নে টাস্কবারের উপরের বারকে স্টেটাস বার বলা হয়। এতে ডকুমেন্টের স্টেটাস বা অবস্থা (অন অথবা অফ) প্রদর্শিত হয়। এই স্টেটাস বারের বাম পাশে Ready লেখা থাকলে বুঝতে হবে কার্সর সেলে আছে এবং এ অবস্থায় কাজ করা যাবে। কোনও লেখা Edit করার সময় এখানে এই এডিট লেখা দেখা যাবে এবং শেষ হলে আবার রেডি মোড ফিরে আসবে।

Sheet Tab কী?

ওয়ার্কবুক উইন্ডোর নীচে বাঁদিকে থাকে শিট ট্যাব। একটি ওয়ার্কবুকে সাধারণত: তিনটি ওয়ার্কশিট থাকে। যেমন: Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3। এছাড়াও প্রয়োজনে Insert মেনু থেকে Worksheet কমান্ড দিয়ে নতুন শিট সন্নিবেশ করা যায়। সব শিটের নীচে শিট ট্যাব থাকে। যে শিটের নামের শিট ট্যাবে ক্লিক করা হবে সে শিটটি চালু হবে।

ফাইল মেনুস্থ বিভিন্ন মেনুর কাজ:

New-এর কাজ: ফাইল মেনুস্থ নিউ মেনু ব্যবহার করে বা নিউ মেনুতে ক্লিক করে নতুন বুকশিট আনা যায়। Ctrl+N কিবোর্ড কমান্ড।

Open-এর কাজ: সেভ করা ফাইল ওপেন করাই এই মেনুর কাজ। ফাইলে ক্লিক করে ডায়লগ বক্সে সেভ করা ফাইলটি নির্বাচন করে ওকে করলেই ফাইলটি ওপেন হবে। Ctrl+O কিবোর্ড কমান্ড।

Close-এর কাজ: ফাইল গুটিয়ে ফেলা বা বন্ধ করা। ফাইল মেনুতে ক্লিক করে ক্লোজ মেনুতে ক্লিক করলে ফাইল বন্ধ হবে বা ক্লোজ হবে। ওপেন থাকা সব সব ফাইল একই নিয়মে ক্লোজ করতে হবে।

Save-এর কাজ: ফাইল সংরক্ষণ করা। কোনও ফাইল সংরক্ষণ বা সেভ করতে হলে এই মেনুতে ক্লিক করলে একটি ডায়লগ বক্স আসবে এখানে যে নামে ফাইলটি সেভ করতে চাই সে নামটি লিখে এন্টার-কি কমান্ড দিয়ে ফাইল সেভ করা যায়। Ctrl+S কি-বোর্ড কমান্ড।

Save As-এর কাজ: একই ফাইল ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করতে এই মেনু ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ফাইল প্রোটেক্ট করতে এই মেনু ব্যবহার করা হয়।

Page Setup-এর কাজ: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মেনু। এর সাহায্যে পাতার আকার ছোট-বড়, পাতা আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি, পাতার মার্জিন ঠিক করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

Print Preview-এর কাজ: প্রিন্টিংয়ের পূর্ব অবস্থা। ডকুমেন্টটি প্রিন্টিংয়ের অর্ডার দিলে কেমন ভাবে প্রিন্টিং হবে তা আগে দেখে নেওয়ার কাজে এই মেনু ব্যবহার করা হয়। মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে একে ওপেন এবং পুনরায় ক্লিক করে আগের অবস্থায় ফিরে আসা যায়।

Edit মেনুস্থ বিভিন্ন মেনুর কাজ:

Undo-এর কাজ: কোনও ডকুমেন্ট বা লেখা ভুলবশত মুছে ফেলা হলে এই Undo মেনু ব্যবহার করে তা ফিরিয়ে আনা যায়। Redo মেনু Undo-এর বিপরীত কাজটি করে থাকে। অর্থাৎ Undo করার পর Redo মেনু ক্লিক করলে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। Redo-এর জন্য Ctrl+Z এবং Undo এর জন্য Ctrl+ y কি-বোর্ড কমান্ড।

Cut-এর কাজ: কোনও লেখা এক স্থান থেকে কেটে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে এই মেনু ব্যবহার করা হয়। Ctrl+X কি-বোর্ড কমান্ড।

Copy-এর কাজ: কোনও লেখা বার বার ব্যবহার করতে এক স্থান থেকে কপি করে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে এই মেনু ব্যবহার করা হয়। Ctrl+C কি-বোর্ড কমান্ড।

Paste এর কাজ: কোনও লেখা এক স্থান থেকে কেটে বা কপি করে অন্য স্থানে বসাতে এই মেনু ব্যবহার করা হয়। Ctrl+V কি-বোর্ড কমান্ড।

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

বিভিন্ন পদের সম্পর্ক

যে কোনও বাক্যে একাধিক পদ থাকে। এইসব পদের মধ্যে আবার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বিশেষ করে বাক্যের অন্যতম প্রধান পদ সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পদের সম্পর্ক থাকে দেখা যায়। তবে অন্যান্য পদের একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্কও থাকে।

যেমন: সে নিজের বাগানে দা দিয়ে গাছ কাটছে। এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া 'কাটছে'। অন্যান্য পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য যদি প্রশ্ন করা হয় কে কাটছে? উত্তর হবে সে। কী কাটছে?- গাছ। কী দিয়ে কাটছে? -দা দিয়ে। কোথায় কাটছে? - বাগানে। ক্রিয়ার সঙ্গে 'সে' এবং অন্যান্য বিশেষ্য পদের সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ককে বলা হয় কারক সম্পর্ক। ক্রিয়ার সঙ্গে শুধু বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্ক থাকে।

আবার ওপরের বাক্যে 'নিজের বাগানে'- এই পদ দুটির মধ্যে 'বাগানে' শব্দের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকলেও 'নিজের' সঙ্গে ক্রিয়াপদের কোনও সম্পর্ক নেই। ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকার জন্য একে বলে অ-কারক সম্পর্ক।

আমরা জানি যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যস্থিত অন্য পদের সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক স্থির করা হয় কিছু চিহ্নের সাহায্যে। যেমন— পাখি সকালবেলায় গাছের কোটরে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। এই বাক্যে কতগুলি শব্দ, যেমন— পাখি, সকালবেলা, গাছ, কোটর, বাচ্চা রয়েছে। এই শব্দগুলির সঙ্গে এই চিহ্নগুলি যুক্ত হয়েছে-সকালবেলা+য়, গাছ+এর, কোটর+এ, বাচ্চা+কে এবং পাখি+০ (শূন্য)। এই য়, এর, এ, কে প্রভৃতি চিহ্ন- এই চিহ্নগুলিকে বলে শব্দ-বিভক্তি। আবার 'খাওয়া' ধাতুর সঙ্গে 'ছে' যুক্ত হয়েছে। একে বলে ধাতু-বিভক্তি। প্রকৃতপক্ষে শব্দের সঙ্গে যে চিহ্নগুলি যোগ হয় সেগুলি সম্পর্কের চিহ্ন। আবার শুধু বিভক্তি যোগ করে শব্দকে পদে পরিণত করে বাক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করা যায় না। প্রথমে উল্লিখিত বাক্য— সে নিজের বাগানে দা দিয়ে গাছ কাটছে। এই বাক্যে শব্দ-বিভক্তি ছাড়া বাক্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য 'দিয়ে' শব্দটি আনতে হয়েছে। একে বলে অনুসর্গ।

ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনামের যে সম্পর্ক থাকে তাকে কারক বলে।

কারক ছ'ধরনের হয়। দেবমন্দিরে পুরোহিত পুষ্পপাত্র থেকে স্বহস্তে পূজার জন্য পুষ্প গ্রহণ করে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। ওপরের এই বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া 'দিলেন'-এর সঙ্গে বাক্য মধ্যস্থিত অন্যান্য বিশেষ্য পদের কোনও না কোনও সম্বন্ধ আছে।

কর্তৃ-সম্বন্ধকে কাজটা করলেন বা দিলেন? পুরোহিত দিলেন। পুরোহিত বিশেষ্য পদটি বাক্যের কর্তৃ-সম্বন্ধ প্রকাশ করছে।

কর্ম-সম্বন্ধ- কী দিলেন? পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পুষ্পাঞ্জলি বিশেষ্য পদটি কর্ম-সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে।

করণ সম্বন্ধ-কর্তা পুরোহিত কিসের সাহায্যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার কাজটা সম্পন্ন করলেন? স্বহস্তে অর্থাৎ নিজের হাতের সাহায্যে। সুতরাং স্বহস্তে এই বিশেষ্য পদটি করণ-সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে।

নিমিত্ত-সম্বন্ধ-পুরোহিত কীসের জন্য পুষ্প দিলেন? পূজার জন্য। সুতরাং পূজার জন্য নিমিত্ত-সম্বন্ধ।

অপাদান-সম্বন্ধ: কোথা থেকে দিলেন? পুষ্পপাত্র থেকে। কর্তা কোথা থেকে দিচ্ছেন-এর উত্তর পুষ্পপাত্র থেকে। তাই পুষ্পপাত্র থেকে পদটি অপাদান- সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে।

অধিকরণ -সম্বন্ধ: কোথায় কাজটি সম্পন্ন হল? দেবমন্দিরে। দেবমন্দিরে বিশেষ্য পদটি অধিকরণ-সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে।

ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের ছ'রকম সম্বন্ধ হয়। তাই কারক ছ'ধরনের।

১) কর্তৃকারক: রবি আম পাড়ছে। এই বাক্যে ক্রিয়ার সম্বন্ধে সম্পর্কিত (কে পাড়ছে) হচ্ছে 'রবি', সম্বন্ধটি কর্তৃ-সম্বন্ধ। অতএব 'রবি' কর্তৃকারক।

বাক্যের অন্তর্গত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম ক্রিয়া সম্পাদন করে, সেগুলিকে কর্তৃকারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কে দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক বাক্যে ক্রিয়াপদের মতোই একটি কর্তা থাকে। ক্রিয়াপদের মতো তা অনুক্ত বা উহ্য থাকতে পারে। তখনও কিন্তু কর্তা আছে ধরে নিতে হয়।- ওখানে যাবে না। এই বাক্যে কর্তা 'তুমি' বা 'তোমরা' উহ্য আছে।

কর্তা নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন: প্রযোজক ও প্রযোজ্য কর্তা, সমধাতুজ কর্তা, ব্যতিহার কর্তা, সহযোগী কর্তা, উহ্য কর্তা, অনুক্ত কর্তা, নিরপেক্ষ কর্তা, কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা, বাক্যাংশ কর্তা, উপবাক্যীয় কর্তা, বহু ক্রিয়ার এক কর্তা, এক ক্রিয়ার বহু কর্তা।

(পরের টিউশনে আমরা এ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানব।)

জেনে রাখো

মানব শরীরের অজানা তথ্য

প্রতিনিয়িত চলছে মানব শরীরের মধ্যে নানা বিচিত্র খেলা। যার বেশিরভাগ তথ্যই সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। এগুলো সম্পর্কে জানলে আমাদের বেশ আশ্চর্য হতে হয়। তবে আমাদের নিজেদের মধ্যেকার বেশ কিছু মজার তথ্য জেনে রাখা ভালো। বিজ্ঞানীদের কাছে মানব শরীরের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপেই আছে বেশ রহস্যময়তা। যেমন আঙুলের মধ্যে কোনও একটি আঙুলের নখ কেন তাড়াতাড়ি বাড়ে, বা কোন আঙুলের নখে মরা কোষের জন্ম কীভাবে হয় এই সব অজানা তথ্যগুলি শুধু যে মজাদার তাই নয়, এর মধ্যে আছে নানা না জানা তথ্য।

- শুরু করা যাক মস্তিষ্ক দিয়ে। আমাদের মস্তিষ্ক পুরো দেহের প্রায় ২০ শতাংশ অক্সিজেন ও ক্যালোরি ব্যবহার করে।
- যার IQ যত বেশি হবে সে তত বেশি স্বপ্ন দেখবে।
- হাতের মধ্যমা আঙুলের নখ অন্যান্য আঙুলের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি হয়।
- আপনার পাকস্থলীতে সৃষ্টি অ্যাসিড যথেষ্ট শক্তিশালী কোনও zinc-কে গলানোর জন্য, কিন্তু সেটি পাকস্থলীর কোনও ক্ষতি করছে না, কারণ পাকস্থলীর কোষের প্রতিনিয়ত পুনর্নবীকরণ হচ্ছে।
- পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হৃদয় স্পন্দন বেশি হয়।
- পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের চোখের পলক দ্বিগুণ বেশি পড়ে।
- জন্ম থেকেই একজন মহিলার ঘ্রাণশক্তি বেশি, অর্থাৎ পুরুষদের থেকে ভালো।
- মহিলাদের চাইতে পুরুষদের হেঁচকি বেশি হয়।
- মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা দ্রুত চর্বি বা মেদ ঝরাতে সক্ষম। প্রতিদিন আনুমানিক ৫০ ক্যালোরির মতো মেদ ঝরাতে পারে।
- পুরুষরা দেহে প্রায় ৬.৮ লিটার রক্ত বহন করে, যেখানে একজন মহিলার দেহে প্রায় ৫ লিটার রক্ত থাকে।
- আপনার পুরো জীবনকালে একখানি মুখের লালার (saliva) সৃষ্টি হয় যে, দুটি সুইমিং পুল তা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব।
- মানব দেহের সব চাইতে বৃহৎ কোষ হল ডিম্বাশয় এবং ক্ষুদ্রতম কোষ হল শুক্রাণু।
- মানব শরীরে দিনের তুলনায় রাতের বেলায় মস্তিষ্ক বেশি সক্রিয় থাকে।
- মুখের লালা যতক্ষণ না খাদ্যের সঙ্গে মিশছে ততক্ষণ আপনি খাদ্যের স্বাদ অনুভব করতে পারবেন না।
- খুব বেশি পরিমাণ খাবারের পর শ্রবণ শক্তি কিছুটা কমে যায়।
- শিশুরা সাধারণত নীল রঙের চোখ নিয়ে জন্মায়। ultraviolet রশ্মির দ্বারা চোখের ম্যালানিনের সম্পূর্ণ গাঢ় হতে সময় লাগে।
- আপনার চোখের কর্ণিয়া-ই দেহের এমন অংশ যেখানে রক্ত সরবরাহ হয় না। হাওয়া থেকে সরাসরি সে তার অক্সিজেন পায়।
- জন্মের পর শিশুরা সবকিছুই সাদা-কালো রূপে দেখে।
- মানব চুলের আনুমানিক আয়ুষ্কাল তিন থেকে সাত বছরের।
- আশ্চর্যের বিষয় মস্তিষ্কের ৮০ শতাংশেই জল রয়েছে।
- চুল বা কেশ অগ্নিদাহ্য, তা আমরা সকলে জানি কিন্তু এছাড়া চুলকে আর কোনওভাবে ধ্বংস করা কঠিন। শক্তিশালী অ্যাসিড দ্বারাও নয়।
- প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে তার নিজস্ব অনন্য গন্ধ, অনন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং জিহ্বাপ্রিন্ট।
- জন্মের পর আপনার চোখের আয়তন একই থাকে কিন্তু নাক ও কান ক্রমবর্ধমান।
- একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনও খাদ্য ছাড়া প্রায় ২০ দিন বেঁচে থাকতে পারবেন, আর পানীয় ছাড়া ২ দিন বেঁচে থাকতে পারবেন।
- দেহের সব চাইতে শক্তিশালী পেশি হল জিহ্বা।
- ত্বকের প্রত্যেক ইঞ্চিতে রয়েছে প্রায় ৩২ মিলিয়নের মতো ব্যাকটেরিয়া, যা বেশিরভাগই ক্ষতিকর নয়।
- দেহের সবচাইতে কঠিনতম হাড় হল চোয়ালের হাড়।
- প্রত্যেক সাতাশ দিন অন্তর দেহের বহিরাগত ত্বকের পুনুরুৎপাদন হয়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

বিজ্ঞানীদের মজার তথ্য

আইজ্যাক নিউটন

স্কুলে তিনি খুব অলস ছাত্র ছিলেন। একদিন ক্লাসে একজন হোমড়া-চোমড়া দুষ্টু ছেলে তার সঙ্গে মশকরা করতে শুরু করে এবং লড়াইয়ে ডাক দেয়। ছোটখাটো চেহারার নিউটন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াইয়ে জেতে আর প্রতিজ্ঞা করে যে এরপর ক্লাসের সবথেকে ভালো ছাত্র হয়ে সে সবাইকে দেখিয়ে দেবে। তার প্রতিজ্ঞা সে সত্যি করে দেখিয়েছিল।

অথচ ছোটবেলায় বই পড়া বা লেখালিখি নিউটনের সবথেকে অপছন্দ ছিল।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

তাঁর জীবনে নিজের কাজের সঙ্গে সবথেকে আপন ছিল লিনা। আইনস্টাইনের বউ, ছেলে কারওর সঙ্গেই সারা জীবন মধুর সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু লিনা, যেটা তাঁর সাধের ভায়োলিন, তাকে তিনি কখনও কাছছাড়া করেননি। আর সবথেকে অপ্রিয় ছিল চুল কাটা।

থমাস আলভা এডিসন

নিজের আবিষ্কৃত প্রায় ১০০০টা জিনিসের পেটেন্ট ভোগ করা এই বিজ্ঞানী ৯ বছর বয়স থেকেই হাতখরচের টাকা দিয়ে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ কিনতেন। এগুলো তাঁর কাছে ছিল অমূল্য। কেউ যাতে হাত না দেয় তাই তিনি শিশিগুলোতে 'বিষ'-বলে লেবেল সেঁটে রাখতেন। দশ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম ল্যাবরেটরি তৈরি করেন।

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: বিজ্ঞান

পরিবেশবান্ধব শক্তি

আগের পর্যায়ে আমরা তড়িৎ শক্তির উৎস ও প্রভাব সম্বন্ধে জেনেছি। আজ আমরা পরিবেশবান্ধব কিছু শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমাদের দৈনন্দিন জীবন এই শক্তিগুলো ছাড়া অচল। এই শক্তির উৎস মূলত আমাদের পরিবেশ। পরিবেশের বিভিন্ন উৎস থেকে নানা মাধ্যম ও যন্ত্রের ব্যবহারে আমরা এই শক্তিকে নিজেদের উপযোগী করে তুলি। এই শক্তিগুলোরও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু এই শক্তিগুলোর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া অবধি এই শক্তিগুলোর ওপর আমাদের জীবন পুরোপুরি নির্ভর। তাই প্রয়োজনের অজুহাতে মানুষ এই শক্তিগুলোর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

তাপশক্তির ব্যবহার: যেসব কাজে তাপশক্তি আমরা ব্যবহার করি সেগুলি হল রান্না করতে, ইস্ত্রি করতে, কামারশালায় লোহা পিটিয়ে নানারকম যন্ত্র তৈরি করতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ইট বানাতে, বিভিন্ন জিনিস পোড়াতে।

তড়িৎশক্তির ব্যবহার: বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক্স জিনিস চালনা করতে তড়িৎ শক্তির প্রয়োজন হয়। ট্রাম চালাতে, ট্রেন-মেট্রোরেল চালাতে, আলো জ্বালাতে, কম্পিউটার চালাতে, মোবাইল ফোন চার্জ দিতে, বড় বড় কলকারখানা চালাতে এই শক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে দিন দিন এই শক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

জীবাশ্ম তেল থেকে পাওয়া শক্তির ব্যবহার: বহু বছর ধরে সমুদ্রের তলায় যে জীবাশ্ম তৈরি হয় তার থেকে যে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পাওয়া যায় তা বিভিন্ন কাজে যেমন জেনারেটর, লঞ্চ, গাড়ি, এরোপ্লেন চালাতে ব্যবহার করা হয়। এই শক্তির ব্যবহারের ফলে আমাদের জীবন হয়েছে অনেক সহজ ও দ্রুত। কারণ বর্তমান যুগের জীবনযাত্রা অনেকটাই নির্ভর করে যানবাহনের উপর।

এই ধরনের প্রচলিত শক্তির চাহিদা বাড়ার মূল কারণ হল জনস্ফীতির সঙ্গে উন্নততর জীবনযাত্রা, নগরায়ন এবং যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কিছু জিনিস সরাসরি যুক্ত, যেমন খাদ্য উৎপাদন, বাসস্থান নির্মাণ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এগুলি আবার প্রচলিত কিছু শক্তির ওপর নির্ভরশীল। মাটির তলায় জীবাশ্ম থেকে আমরা যে শক্তি পাই তা তৈরি হতে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে, আবার এই শক্তির জোগানও সীমিত। মানুষ খুব কম সময়ের মধ্যে এই শক্তির অধিকাংশ ব্যয় করে ফেলেছে। এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে একদিন কয়লা ও খনিজ তেলের ভাণ্ডারও শেষ হয়ে যাবে। তবে এই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যত বেড়েছে পরিবেশে বেড়েছে তার দহনে উৎপন্ন পদার্থগুলির বহুমুখী ক্ষতিকারক প্রভাব। এই ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচতে গেলে নিজেদের বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হবে, যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি করবে। এগুলোই হল পরিবেশবান্ধব শক্তি।

এগুলি হল সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জৈবশক্তি।

উদ্ভিদ ও প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে অন্যতম হল সৌরশক্তি। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা বাড়ার ফলে সৌরকোষের ব্যবহার শুরু হয়েছে। দিনেরবেলা যে সূর্যের

আলো পৃথিবীতে এসে পৌছয়, তাকে কাজে লাগিয়ে এই সৌরকোষে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তারপর সৌর প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ব্যাটারিতে তা সঞ্চয় করা হয়। রাতেরবেলা বা কম সূর্যের আলোতে তা ব্যবহার করা যায়। আশা করা যায় আগামিদিনে এই শক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে দেখা যাবে।

বায়ুশক্তি:

আরও একটি পরিবেশবান্ধব শক্তি যা খুব একটা এখনও ব্যবহৃত হয়নি তা হল বায়ুশক্তি। বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা সম্ভব। বায়ুপ্রবাহের শক্তি ব্যবহারের কিছু সুবিধা আছে সেগুলি হল—

১) বায়ুর কোনও অভাব নেই, কোনওদিন বায়ু ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

২) বায়ুকল একবার বসলে দীর্ঘদিন চলবে।

৩) যে-সমস্ত জায়গায় দূর থেকে তার সংযোগ করে বিদ্যুৎ আনা সম্ভব নয়, সেখানে বায়ুশক্তির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

৪) বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার না করে বায়ুশক্তির সাহায্যে পালতোলা নৌকা চালানো হয়।

জৈবশক্তি:

জৈব বর্জ্য বা জৈব উৎসজাত পাওয়া জিনিস থেকে উৎপন্ন জৈব গ্যাস থেকে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তা হল জৈবশক্তি।

এসব প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বর্জ্য পদার্থের ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং সহজলভ্য। জ্বালানির কাজে এই শক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, মাটির নীচের তাপশক্তিকে প্রচলিত শক্তির বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। অপ্রচলিত পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে সকলের সচেতনতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: ইতিহাস

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রাজস্বের নীতি

ওয়ারেন হেস্টিংস মনে করেন ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করলে শাসনব্যবস্থার উন্নতি হবে তাই তিনি ফরাসি ও ভারতীয় ভাষা জানা লোকজনকে রাজস্ব দফতরে নিয়োগ করেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থকে ইংরেজি ভাষায় এবং কোম্পানির নিয়মনীতি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে তিনি আইনব্যবস্থাকে সবার কাছে সহজবোধ্য করে তোলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে চার্লস উইলকিন, ব্রাসি হালেদ প্রমুখ পণ্ডিত সংস্কৃত পণ্ডিতদের কলকাতায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ করে দেন, আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা চালু করেন।

উইলিয়াম জোনস প্রশাসন ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন যাতে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে শিক্ষার আদানপ্রদান হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা বহু গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন। এই সোসাইটির বিভিন্ন সদস্য আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেও পড়াতেন। পরে তাঁরা ভারতীয় পণ্ডিতদেরও সেখানে নিয়োগ করেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ মিশনারি সোসাইটির সদস্য আলেকজান্ডার ডাফ বেশ কয়েকটি মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃত পণ্ডিত হেম্যান উইলসন সংস্কৃত কলেজে পড়ানো শুরু করেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতচর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিকাশ। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড ও ডেভিড হেয়ারের নেতৃত্বে কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধনী ও গুণী মানুষ এটি পরিচালনা করতেন।

এইসব উদ্যোগের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত উন্নতি ঘটে। যদিও প্রশাসন ইংরেজি শিক্ষার ওপরেই বেশি জোর দিয়েছিল, তবে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল। চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে আবশ্যিক করা হয়। এরপর ক্রমেই শিক্ষার বিস্তার হতে থাকে। ফলে ছাত্র ও শিক্ষার বরাদ্দ অর্থের পরিমাণও বাড়তে থাকে। ১৮৪৩ সালে বাংলায় 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' তৈরি হয়।

ব্রিটিশ প্রশাসনের মনে হয় বোম্বে শহরের মাধ্যমেই ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়াশোনার দাবি উঠেছে, তাই এটিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তার পরে এটিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে খ্রিস্টান মিশনারির উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক প্রশাসন শিক্ষা বিস্তারের যে জরুরি নীতি নিয়েছিল তার কতগুলি জরুরি দিক ছিল, তাঁরা নিজেদের সুবিধার্থে সমাজের এক শ্রেণির মানুষকে শিক্ষিত করে তুলে তাদের প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবে সমাজের সব স্তরের মানুষকে শিক্ষিত করার কোনও ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। এইজন্যই তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন। হাতে-কলমে শিক্ষার পরিকাঠামো সেভাবে ছিল না বলে পুথিগত বিদ্যার উপরেই মানুষের জ্ঞান গণ্ডিবদ্ধ থাকে, ফলে শিক্ষার মান যে খুব উন্নত ছিল তা-ও বলা যায় না। প্রথমে নারীশিক্ষার ব্যাপারটাও অবহেলা করা হয়েছিল। পরে কিছু সহৃদয় মানুষের উদ্যোগে শুরু হয় নারীশিক্ষার বিস্তার। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিটন সাহেব যাঁর উদ্যোগে তৈরি হয় বেথুন স্কুল। এছাড়াও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ছিল অন্ধ সমর্থন, ফলে এই শিক্ষার পরিকাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে।

জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ণয়:

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে কলকাতা থেকে কুলপি পর্যন্ত ২৪টি পরগনার জমিদারি পায়। রবার্ট ক্লাইভ জমি জরিপের জন্য জরিপবিদ নিয়োগ করেন, কারণ সেই সময় জমির ভিত্তিতে রাজস্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু হয়। এই সময় ফ্র্যাংকল্যান্ড জমি জরিপের কাজ শুরু করলেও তা শেষ করেন হগ ক্যামেরন। ব্রিটিশ কোম্পানি নিযুক্ত ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন জেমস রেনেল যিনি, বাংলার নদীপথগুলি জরিপ করে ১৬টি মানচিত্র বানান যা ছিল বাংলার নদীপথের প্রথম মানচিত্র।

বক্সারের যুদ্ধের পরে কোম্পানির জমি জরিপের তাগিদ আরও বেড়ে যায় রাজস্বের লোভে। সেই সময় কম্পট্রোলিং কাউন্সিল অব রেভিনিউ নামে একটি কমিটি গঠিত হয়, এছাড়াও আরও একটি কমিটি ছিল যার নাম কমিটি অব রেভিনিউ।

পরবর্তীকালে এটির নাম হয় বোর্ড অব রেভিনিউ। এরাই রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করত। জমির দায়িত্ব দেওয়া হতো ইজারাদারি ব্যবস্থায়, যে সবথেকে বেশি ইজারা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত জমির দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হতো, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল বেশিরভাগ ইজারাদারই গ্রামের বাইরের ফলে তারা ঠিকমতো রাজস্ব নির্ণয় করতে পারত না। অনেকে আবার দেয় রাজস্ব শোধ দিতে পারত না। এরপরে কোম্পানি দশসালা ব্যবস্থা চালু করে। পরবর্তীকালে এই সব বন্ধ করে লর্ড কর্নওয়ালিস চালু করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

এর সূত্র ধরেই বাংলায় রাজস্ব আদায়ের এক নতুন পর্যায় চালু হয়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

প্রাণিকলা

আজ আমাদের পাঠ্য প্রাণিদেহের কলা। কলা এমন একপ্রকারের কোষসমষ্টি যারা একত্রিতভাবে এক রকমের কাজ করে। তাই এদের গঠন ও কাজে নানারকমের ভেদাভেদ দেখা যায়।

আবরণী কলা: যে কলা দ্বারা দেহের ভিতরের ও বাইরের আবরণস্তর ও গ্রন্থি গঠিত হয় তাকে আবরণী কলা বলে।

ক) আঁইশাকার আবরণী কলা— এটি রক্তবাহ ও হৃৎপিণ্ডের ভিতরের আবরণী, ফুসফুসের বায়ুথলি, বাওম্যানস ক্যাপসুলে, হেনরির লুপে এবং মুখবিবরে থাকে। এটি একস্তর বিশিষ্ট, চ্যাপটা ও অসম আকৃতিযুক্ত কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলি ভিত্তিপর্দার উপর সাজানো থাকে এবং প্রতি কোষে একটি গোলাকার বা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে। এটি দেহের মুক্তাংশের আবরক, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের আদানপ্রদানের মাধ্যম ও পরিস্রাবক ঝিল্লি হিসাবে কাজ করে।

খ) ঘনকাকার আবরণী কলা— লালাগ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, অগ্নাশয় নালি, ডিম্বাশয়ের আবরক ঝিল্লিতে এই কলার অবস্থান। এটি একস্তর ঘনকাকার কোষ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষে একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস ও দানাদার সাইটোপ্লাজম থাকে। এর কাজ সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে সুরক্ষা প্রদান করা এবং ক্ষরণ, রেচন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা।

গ) স্তম্ভাকার আবরণী কলা— এই আবরণী কলা গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। এই কলা একস্তর স্তম্ভাকার কোষদ্বারা গঠিত। এই কলাও সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে ও শোষণে সাহায্য করে।

ঘ) রোমশ আবরণী কলা— শ্বাসনালির ঊর্ধ্বাংশে, ফ্যালোপিয়ান নালি ও জরায়ুতে এই কলা থাকে। এই কলা একস্তরবিশিষ্ট ঘনকাকার বা স্তম্ভাকার কোষ দিয়ে তৈরি। প্রতিটি কোষের মুক্তপ্রান্তে সিলিয়া থাকে। কোষগুলিতে নিউক্লিয়াস ভিত্তিপর্দার দিকে অবস্থিত। সিলিয়াগুলি সঞ্চালনের ফলে মিউকাস, ডিম্বাণু ইত্যাদির সঞ্চালন ঘটে।

ঙ) গ্রন্থিময় আবরণী কলা— এই আবরণী কলা লালাগ্রন্থি, যকৃত, ঘর্মগ্রন্থি, পিটুইটারি, থাইরয়েড, অগ্নাশয়, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় প্রভৃতি অংশে দেখা যায়। এই গ্রন্থিগুলি এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। পাচক, উৎসেচক, হরমোন, মিউকাস প্রভৃতি নিঃসরণ করে।

পেশি কলা: যে কলার সংকোচনশীলতা ধর্মের জন্য প্রাণীর অঙ্গ সঞ্চালন ঘটে তাকে পেশি কলা বলে।

ক) মসৃণ পেশি বা অনৈচ্ছিক পেশি— এই পেশি কলা গ্রাসনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, জরায়ু, শ্বাসনালি, মূত্রথলি, পিত্তথলি, শিরা ও ধমনির প্রাচীর, গ্রন্থির নালি, চোখের সিলিয়ারি পেশি ইত্যাদিতে অবস্থান করে। এই পেশি কলার পেশিতন্তুকে ঘিরে যোগকলার পাতলা আবরণ থাকে। পেশিতন্তুর গুচ্ছের চারপাশে স্থূল কোলাজেন ও স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। পাকস্থলির নালি ও পুংজনন নালির ক্রমসংকোচন চলনে সাহায্য করে। অনৈচ্ছিক পেশি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে সংকুচিত করতে সাহায্য করে।

খ) অমসৃণ পেশি বা ঐচ্ছিক পেশি-- এই পেশি অস্থির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এই পেশিতে অনুপ্রস্থ রেখা থাকে। এর পেশিকোষে সারকোলেমা পর্দা থাকে এবং পেশিকোষের সাইটোপ্লাজমকে সারকোপ্লাজম বলে। এদের কোষে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে। ঐচ্ছিক পেশি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে চলন ও গমনে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় কারক হিসাবে কাজ করে ও দেহাকৃতি গঠন করে।

গ) হৃদপেশি— হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ রেখা থাকে। এই পেশির সারকোলেমা ঐচ্ছিক পেশির মতো। এই পেশির পেশিকোষে অসংখ্য বৃহদাকার মাইটোকনড্রিয়া ও একটি করে নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশিতে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে। এই পেশি হৃৎপিণ্ডকে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে সাহায্য করে।

যোগ কলা: যে কলা দেহের বিভিন্ন কলা বা অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তাকে যোগ কলা বলে।

ক) অ্যারিওলার কলা— এই কলা ত্বকের নীচে, পেশিতে, স্নায়ুর ফাঁকে, রক্তবাহে অর্থাৎ দেহের প্রায় সব অংশেই অবস্থান করে। অর্ধতরল ধাত্র ও কোলাজেন তন্তু নিয়ে এই কলা গঠিত। এছাড়াও এই কলাতে ফাইব্রোব্লাস্ট, ম্যাক্রোফাজ, প্লাজমা কোষ, মাস্ট কোষ থাকে। এই কলার ধাত্র রক্তবাহ থেকে শ্বাসবায়ু ও পুষ্টিরস পরিবহণ করে। এই কলা দৃঢ়তাপ্রদানকারী স্থিতিস্থাপক কলা হিসাবে কাজ করে।

খ) অ্যাডিপোজ কলা বা মেদ কলা-- চামড়ার নীচে, বৃক্কে, হৃৎপিণ্ডের চারপাশে, উদরগহ্বরের পেরিটোনিয়ামে অ্যাডিপোজ কলা দেখা যায়। এই কলার ফ্যাটকোষ ঘনভাবে অবস্থিত। এতে সঞ্চিত মেদ ভবিষ্যতের খাদ্যের যোগান দেয় ও দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই কলা দেহের অঙ্গ ও তন্ত্র সমূহকে যথাযথ জায়গায় রাখতে ও তাদের যান্ত্রিক আঘাত থেকে রক্ষা করে।

গ) অস্থি কলা— দেহের কংকালে এর অবস্থান। এই কলায় ক্যালসিয়াম যৌগ দ্বারা গঠিত কঠিন ধাত্র থাকে। এই যোগ কলাতে অস্টিয়োব্লাস্ট, অস্টিয়োক্লাস্ট, অস্টিয়োসাইট ইত্যাদি কোষ থাকে। দেহকাঠামো গঠন, দেহের ভার বহন ও দেহের বিভিন্ন অংশকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, গমন ও রক্তকোষের সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভূগোল

বায়ুমণ্ডল

ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত যে গ্যাসের আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে।

বায়ুমণ্ডল একটি যৌগিক মিশ্রণ। এতে তিনটি উপাদান থাকে।

গ্যাস: বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন (৭৮.১%) ও অক্সিজেন (২০.৯%) বায়ুমণ্ডলের ৯৯% দখল করে রেখেছে। বাকি ১ ভাগে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন, মিথেন প্রভৃতি।

১) **নাইট্রোজেন:** নাইট্রোজেন গ্যাস প্রাণিজগৎকে পরোক্ষভাবে উপকৃত করে। মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নিয়ে মাটিতে মিশিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

২) **অক্সিজেন:** অক্সিজেন প্রাণিজগতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস। এছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এটি রাসায়নিক আবহবিকার ঘটাতেও সাহায্য করে।

৩) **কার্বন ডাই-অক্সাইড:** বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সবথেকে কম কিন্তু এর প্রভাব উদ্ভিদ জগতের উপর সবথেকে বেশি। কারণ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের জন্যে বায়ু থেকে এই গ্যাস গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে এই গ্যাসের পরিমাণ বেশি সেখানে গরমও বেশি। এই গ্যাস বৃষ্টির সঙ্গে মিশে চুনজাতীয় শিলায় রাসায়নিক আবহবিকার ঘটায়।

৪) **ওজোন গ্যাস:** স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ২৫-৪০ কিমি জুড়ে আছে এই গ্যাস যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। এই রশ্মি প্রাণিজগতের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এই গ্যাস জীবকুলকে রক্ষা করছে। তবে এই স্তর নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জলীয়বাষ্প: বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ খুব কম (১.৪%)। ৯০% জলীয়বাষ্পই বায়ুর নীচের স্তরে থাকে।

জলীয়বাষ্পের জন্যই পৃথিবীতে মেঘ, শিশির, কুয়াশা, বৃষ্টি হয়। জলীয়বাষ্পের তারতম্যে বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। জলীয়বাষ্পের লীনতাপ বায়ুমণ্ডলের শক্তির উৎস। এই জলীয়বাষ্পের উপর বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণ নির্ভর করে।

ধূলিকণা: বায়ুমণ্ডলের অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ধূলিকণা বা এরোসোল। বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে অবস্থিত ধূলিকণা, ছাই, ভস্ম, লবণ, কয়লা এদেরই বলে এরোসোল। aero মানে বাতাস sol মানে কণা।

ধূলিকণা সূর্যতাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এর সাহায্যে আকাশে রামধনু সৃষ্টি হয় ও সূর্যরশ্মির সামান্য অংশ প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। ধূলিকণা জলীয়বাষ্পকে ঘনীভূত করে মেঘ ও কুয়াশার সৃষ্টি করে।

উপাদান ও উষ্ণতার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস:

বায়ুমণ্ডলের স্তরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

১) উপাদান বা রাসায়নিক গঠন অনুসারে স্তরবিন্যাস:

হোমোস্ফিয়ার: হোমো মানে সম, স্ফিয়ার মানে অঞ্চল। ভূপৃষ্ঠের ৯০ কিমি জুড়ে বায়ুমণ্ডলের উপাদানের অনুপাত মোটামুটি একই ধরনের থাকে তাই একে বলে হোমোস্ফিয়ার বা সমমণ্ডল। একে চার ভাগে ভাগ করা যায়— ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার।

হেটেরোস্ফিয়ার: হেটেরো মানে বিষম। এই মণ্ডলে বায়ুর গঠনগত উপাদানগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ৯০-১০,০০০ কিমি জুড়ে এর বিস্তার। একে চার ভাগে ভাগ করা হয়— আণবিক নাইট্রোজেন স্তর, পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর, হিলিয়াম স্তর, হাইড্রোজেন স্তর।

২) উচ্চতা ও উষ্ণতার ভিত্তিতে:

ট্রপোস্ফিয়ার: ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৭ কিমি এবং মেরু অঞ্চলে ৮ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে ট্রপোস্ফিয়ার বলে। এর গড় উচ্চতা ধরা হয় ১২ কিমি, এই স্তরে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস থাকে। প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬.৪ ডিগ্রি হারে এখানে উষ্ণতা কমে, এই স্তরে ঝড়-বৃষ্টি হয় বলে একে ক্ষুব্ধমণ্ডল বলে। মধ্য অক্ষাংশে এর উষ্ণতা প্রায় -৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার: ট্রপোস্ফিয়ারের পরে ১২-৫০ কিমি জুড়ে এই স্তর অবস্থিত। এই দুই স্তরের সংযোগ স্থলের ১ কিমি স্থানকে ট্রপোপজ বলে। এই স্তর শান্ত ও মেঘহীন। জেটবিমানগুলি এখান দিয়ে চলাচল করে। ওজোন গ্যাস এই স্তরে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।

মেসোস্ফিয়ার: স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরে ৫০ কিমি পর্যন্ত স্তরকে মেসোস্ফিয়ার বলে আর এই দুই স্তরের সংযোগস্থলকে বলে স্ট্রাপোপজ। এখানে উষ্ণতা -৮৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে কমতে থাকে তাই এটি খুব শীতল ও কম বায়ুচাপ যুক্ত হয়। এখানে উল্কাপিণ্ড ছাই হয় এবং অধিক উচ্চতায় জলীয়বাষ্প ও হালকা মেঘ দেখা যায়।

আয়নোস্ফিয়ার: মাটি থেকে ৮০-৪৮০ কিমি উচ্চতাবিশিষ্ট স্তরকে থার্মোস্ফিয়ার বলে। এর নিম্নাংশ হল আয়নোস্ফিয়ার। অত্যধিক উষ্ণতার জন্য তাপ বিকিরণের ফলে সূর্যাস্তের পর মেরুজ্যোতি দেখা যায়। বেতার তরঙ্গ এই স্তরকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এর মূল আণবিক উপাদান নাইট্রোজেন ও পারমাণবিক শক্তি। ইলেকট্রনের ঘনত্বের ভিত্তিতে এই স্তরকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়।

এক্সোস্ফিয়ার: থার্মোস্ফিয়ারের উপরে ৫০০-৭০০ কিমি পর্যন্ত এই স্তর। এখানে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরিমাণ বেশি। এখানে উচ্চতার সঙ্গে উষ্ণতা কমতে থাকে।

ম্যাগনেটোস্ফিয়ার: একদম শেষের স্তর হল এটি। এখানে ইলেকট্রন ও প্রোটন বেশি। এখানে সৌরবায়ু ধরা পড়ে। এখানে পৃথিবীর চৌম্বকীয় বল থেমে যায় যাকে ম্যাগনেটোপজ বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই স্তর ঘন বলয় হিসাবে অবস্থান করে যাকে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ স্তর বলে।

বিজ্ঞানীদের মজার তথ্য

গ্যালিলিও গ্যালিলি

আইনস্টাইন এঁকে আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক বলেছেন। কিন্তু গ্যালিলিও বেশ কিছু রোজকার ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিস বানাতে বিফল হন, যেমন, টমেটো তোলার অটোমেটিক যন্ত্র, পকেট চিরুনি, বল পয়েন্ট পেন ইত্যাদি।

মাদাম ক্যুরি

মাদাম ক্যুরি বিজ্ঞান আর অঙ্ককে সবথেকে বেশি ভালোবাসতেন। টাকার প্রয়োজনে তিনি কলেজে ল্যাবরেটরির কাচের জিনিস পরিষ্কারের কাজ নেন। যাতে তিনি তাঁর ভালোলাগার জগতেই থাকতে পারেন।

প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্ল-রা রোল নং ওয়ান’ বিভাগে যোগ দিতে পারো।
ফোন: 033 40605837 (১২টা থেকে ৬টা), ই-মেইল: jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

সম্প্রীতির অপর নাম রাখিবন্ধন উৎসব

বিপাশা চক্রবর্তী

রাখি একটি পবিত্র উৎসব। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের প্রায় অনেক রাজ্যেই রাখিবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মূলত বোনেরা তাঁর ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে তাদের হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। শ্রাবণ মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় রাখিবন্ধন উৎসব। তবে উৎসব ঠিক কবে কীভাবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তারিত ইতিহাস আছে। তবে এই নিয়ে নানা মতবাদও রয়েছে। যাই থাকুক না কেন নির্বিশেষে রাখি একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হিসাবেই পালিত হয়।

রাখির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক

বাঙালির রাখির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে এই উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশাপাশি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ রাখিবন্ধন উৎসবকে জাতীয় ঐক্যবন্ধনের হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। এখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে রাখিকে কাজে লাগানো হয়। তবে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশে রাখিবন্ধন একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই মানবতার মন্ত্রকে আত্মস্থ করে শতবর্ষ পরে রাখিবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শুধু ভাই-বোনের মৈত্রীর বন্ধন নয়, মানবতা ও সম্প্রীতির প্রতীক হল এই উৎসহ। সেই সঙ্গে এই উৎসব ভ্রাতৃত্বের প্রতীকও বটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে বাংলার মাটি, 'বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল— পূণ্য হউক, পূণ্য হউক' গানটি রচনা করেন।

রাখি ও তার ইতিহাস

আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতায় আর্যদের সময় রাখির প্রচলন ছিল। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হয়ে রাজপুতানায় এসেছিল রাখি।

তবে পৌরাণিক এক কাহিনি থেকে জানা যায়, দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামে দেবতারা পরাজিত হলে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়লাভের পথ খুঁজতে দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে যখন যাচ্ছিলেন, সেইসময় ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী দেবরাজকে বললেন, তিনি জানেন কী উপায়ে অসুরদের পরাজিত করা যায়। আর সেই উপায় হিসাবে পরদিন শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে ইন্দ্রাণী স্বামীর হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন রক্ষাকবচ। তারপর ইন্দ্র অসুরদের পরাজিত করতে সমর্থ হলেন । এই রক্ষাকবচটি ছিল একটি রাখি। পৌরাণিক কাহিনি স্ত্রী স্বামীর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রীতির পরিবর্তন হয়, তখন থেকে সাধারণত বোনেরা ভাইদের অথবা কোনও প্রিয়জনের হাতে রাখি বেঁধে দেয়।

অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, আর্যদের প্রভাবেই এই বাংলায় রাখিবন্ধন শুরু হয়। পরবর্তীকালে অবাঙালি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের আগমন ও বঙ্গভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে তাদের দেখাদেখি রাখিবন্ধন এই বাংলায় জনপ্রিয় হতে থাকে। একটা সময় ছিল, যখন আমাদের দেশের পুরোহিত প্রধানরা তাঁদের শত শত শিষ্যের হাতে রাখি পরিয়ে দিতেন। পুরাণ কাহিনি থেকে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ-কামনায় মা যশোদা রাখিপূর্ণিমার দিন পুত্রের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই নারীরাই পুরুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে আসছেন। বোন ভাইকে রাখি পরায় অথবা ভাই ভেবে বরণ করে নিতে চায়, এমন ভাবেই রাখির বন্ধনে জড়িয়ে নেয়।

অপর একটি ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুভদ্রা কৃষ্ণের ছোট বোন, কৃষ্ণ সুভদ্রাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তবে আপন বোন না হয়েও দ্রৌপদী ছিলেন কৃষ্ণের অতীব স্নেহভাজন। একদিন সুভদ্রা কিছুটা অভিমান করে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন এর কারণ। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন যথা সময়ে এর কারণ তুমি বুঝতে পারবে। এর কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে রক্ত পড়ছিল, তা দেখে সুভদ্রা রক্ত বন্ধের জন্য কাপড় খুঁজছিলেন, কিন্তু মনমতো পাতলা সাধারণ কাপড় পাচ্ছিলেন না। এর মাঝে দ্রৌপদী সেখানে আসলেন, দেখে বিন্দুমাত্র দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মূল্যবান রেশম শাড়ি ছিঁড়ে কৃষ্ণের হাত বেঁধে দিলেন। কিছুক্ষণ পর রক্তপাত বন্ধ হল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বোন সুভদ্রাকে ডেকে বললেন- এখন বুঝতে পেরেছ কেন আমি দ্রৌপদীকে এত স্নেহ করি? সুভদ্রা বুঝতে পারলেন ভক্তি ও পবিত্র ভালোবাসা, শ্রদ্ধা কী জিনিস! দাদা কৃষ্ণের চেয়ে মূল্যবান বস্ত্র নিজের কাছে বেশি প্রিয় এটা ভেবে সুভদ্রা দারুণ লজ্জিত হলেন। কোনও বোন তার ভাইয়ের কোনওরূপ কষ্ট, অমঙ্গল সহ্য করতে পারে না। ভাইয়ের কষ্ট দূরের জন্য সে সর্বত্তম চেষ্টা করে। অন্যদিকে ভাইও তার বোনকে পৃথিবীতে সর্বাধিক স্নেহ করে, সারাজীবন তাকে রক্ষা করে, যেরকম শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে রাজসভায় চরম কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছিলেন। সকল ভাই-বোনের উচিত সেই সুন্দর সম্পর্ককে চিরকাল বজায় রাখা।

রাখিবন্ধন উৎসবের পিছনে রয়েছে অপর একটি জনপ্রিয় গল্প। চিতোরের রানি কর্ণবতী ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে একটি রাখি পাঠান। গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলে বিধবা রানি কর্ণবতী অসহায় বোধ করেন এবং তিনি হুমায়ুনকে একটি রাখি পাঠিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কর্ণবতীর রাখি প্রেরণে অভিভূত হয়ে হুমায়ুন চিতোর রক্ষা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তবে হুমায়ুনের সেনা পাঠাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাহাদুর শাহ রানির দুর্গ জয় করে নিয়েছিলেন। আরও জানা যায়, বাহাদুর শাহের সেনাবাহিনীর হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য ১৫৩৫ সালের ৮ মার্চ রানি কর্ণবতী ১৩,০০০ পুরস্ত্রীকে নিয়ে জহর ব্রত পালন করে আগুনে আত্মাহুতি দেন।

তবে চিতোরে পৌঁছে হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে দুর্গ থেকে উৎখাত করেন এবং কর্ণবতীর ছেলে বিক্রমজি সিংকে সিংহাসনে বসান।

ইতিহাসের অপর একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহামতি আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোজানা রাজা পুরুকে একটি পবিত্র সুতো পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন আলেকজান্ডারের ক্ষতি না করার জন্য। পুরু রোজানার অনুরোধ রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে আলেকজান্ডারকে আঘাত করেননি।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

ক্যুইজ

১) অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডের সংখ্যা কটি?
২) রেটিনার অন্ধবিন্দুতে কী থাকে না?
৩) মাছির লার্ভাকে কী বলে?
৪) লালারস দিয়ে রেচিত হয় এমন একটি ভারী ধাতু কী?
৫) পিত্তরসের উৎসস্থল কী?
৬) লালারসের কোন উৎসেচক ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে?
৭) কীসের আধিক্যে পেশি ক্লান্ত হয়?
৮) কোন পেশিতে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক আছে?
৯) বুক-গিল কোন প্রাণীর শ্বাসঅঙ্গ?
১০) কোন ফুলে শামুক দিয়ে পরাগ সংযোগ ঘটে?
১১) উপপত্র কাঁটার রূপ নেয় কোন গাছে?
১২) কাণ্ডের অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয় কোথায় দেখা যায়?
১৩) বহুযোজী মূলত্র আছে কোন গাছে?
১৪) মিথাইল কোবালামিন কী?
১৫) থ্রম্বোপ্লাসটিন কোথা থেকে উৎপন্ন হয়?
১৬) কোন শ্বেত কণিকা এলার্জি প্রতিরোধ করে?
১৭) চালতার ভোজ্য অংশটি কী?
১৮) মানব শরীরের জৈব রসায়নাগর কাকে বলে?
১৯) লোহিত কণিকার অতিবৃদ্ধিকে কী বলে?
২০) চর্বিকে উৎসেচক লাইপেজ কীসে রূপান্তরিত করে?
২১) হকি স্টিক তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহৃত হয়?
২২) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণুটি কী?
২৩) এককোষী প্রাণী ও উদ্ভিদরা কোন গ্রুপের অন্তর্গত?
২৪) পতঙ্গদের রেচন অঙ্গ কোনটি?
২৫) নিষেক প্রক্রিয়া ছাড়া ফল উৎপন্ন হওয়াকে কী বলে?
২৬) আন্তঃকোষের তরলে কোন খনিজের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়?
২৭) লাক্ষা বা গালা আসলে কী?
২৮) টাইটান কোন গ্রহের উপগ্রহ?
২৯) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে মহাকাশচারীরা আকাশকে কী রঙে দেখেন?
৩০) কোনও বস্তুর ঘনত্ব বলতে কী বোঝায়?
৩১) চাপ পরিমাপ করা হয় কোন এককে?
৩২) মাইক্রোস্কোপ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে কোষের গঠন জানা যায়?
৩৩) রেশম মথে কার ভিতরে পিউপা থাকে?
৩৪) কোন গাছের পত্রবৃন্ত ফলকের মতো প্রসারিত?
৩৫) কেঁচোর দেহে হিমোগ্লোবিন কোথায় থাকে?
৩৬) গোদ রোগের জীবাণুর নাম কী?
৩৭) কোন মথ বছরে একবার ডিম পাড়ে?
৩৮) ক্লোরোপ্লাস্টিডের কোথায় ক্লোরোফিল থাকে?
৩৯) কার জীবনচক্রে টরুলা দশা দেখা যায়?
৪০) টাইফয়েড ব্যাকটিরিয়ার আকৃতি কেমন?

৪১) দুধের কেসিন রাসায়নিকভাবে কী জাতীয়?
৪২) কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকাকে কী বলে?
৪৩) প্রাণীর দেহের কঠিনতম পদার্থ কী?
৪৪) বৃক্ষের পাথর মূলত কী?
৪৫) কোন পর্বতকে জাপানি আল্পস বলে?

উত্তর: ১) ৩টি। ২) রড ও কোণ কোষ। ৩) ম্যাগট। ৪) পারদ। ৫) যকৃত। ৬) লাইসোজোম। ৭) ল্যাকটিক অ্যাসিড। ৮) হৃৎপেশি। ৯) চিংড়ি। ১০) ওল, কচু। ১১) বাবলা। ১২) আলু। ১৩) কেয়া গাছে। ১৪) এক ধরনের সিউডোভিটামিন। ১৫) অণুচক্রিকা। ১৬) ইওসিনোফিল। ১৭) বৃত্যাংশ। ১৮) যকৃত। ১৯) পলিসাইথেমিয়া। ২০) ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারিনে। ২১) স্যালিক্স কাঠ। ২২) ক্লোরোপ্লাস্ট। ২৩) প্রোটিস্টার ২৪) ম্যালপিজিয়ান নালিকা। ২৫) পার্থেনোকার্পি। ২৬) সোডিয়াম। ২৭) কীটের শরীর থেকে নিঃসৃত রস। ২৮) শনি। ২৯) কালো। ৩০) প্রতি একক আয়তনের ভর। ৩১) পাস্কাল। ৩২) অটোরেডিওগ্রাফি। ৩৩) কুকুন। ৩৪) আকাশমণি। ৩৫) রক্তরসে। ৩৬) উচেরেরিয়া ব্যানক্রফটি। ৩৭) ইউনিভোল্টাইন। ৩৮) গ্রানা। ৩৯) মিউকরের। ৪০) দণ্ডাকার। ৪১) প্রোটিন। ৪২) অ্যাপনিয়া। ৪৩) এনামেল। ৪৪) অক্সালেটর কেলাস। ৪৫) হিডা পর্বত।

এডু টিপস

পড়ার প্রতি মনোযোগ বাড়াতে যে বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন

অনেক বাচ্চাকেই দেখা যায় পড়তে বসার পর পড়ায় মন দিতে পারে না। কিছুক্ষণ পড়ার পরই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। যাই করা হোক না কোনওভাবেই পড়াতে তার মন বসানো যায় না। ফলে বাবা-মাও চিন্তায় হয়ে পড়েন। তাকে বকাঝকা করতে থাকেন। এরপর তার আরও জেদ বেড়ে যায়। ফলে সে একগুয়ে হয়ে ওঠে। এতে বাচ্চাটিরই ক্ষতি হয়। কিন্তু একটি বাচ্চার পড়ার প্রতি মনোযোগ তৈরি করতে হলে প্রাথমিক কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন: বাচ্চার পড়ার প্রতি মনোযোগ বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে সে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে। যে যেখানে পড়ছে অর্থাৎ পড়ার টেবিলটি সুন্দর করে গোছানো হতে হবে। পড়ার টেবিলে পড়ার জিনিসপত্র ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কোনও জিনিস না রাখাই ভালো। মোবাইল বা অন্য কোনওরকম ইলেকট্রনিক্স জিনিস বা খেলনা রাখা উচিত নয়।

পড়ার ঘরের আলো: রিডিং রুমে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এবং অবশ্যই সেই আলো চোখের জন্য আরামদায়ক হতে হবে। আলো যেন খুব তীব্র না হয়। প্রয়োজন হলে পড়ার টেবিলে একটা টেবিল ল্যাম্প রাখা যেতে পারে।

রুটিন তৈরি করতে হবে: ভালো করে পড়াশোনার জন্য প্রথমেই রুটিন করে নেওয়া উচিত। কোন বিষয় কতটুকু সময় পড়তে হবে সেটা আগে থেকে ঠিক থাকলে পড়াশোনা করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও যেটা পড়া হচ্ছে সেটা পড়ার পর লিখে নিলে পড়াটা ভালো মনে থাকে। তাই লেখার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নেওয়া উচিত। রুটিন অনুযায়ী ঘড়ি ধরে পড়তে পারলে পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ তৈরি হয়।

একটানা অনেকক্ষণ পড়া নয়: কোনও একটি বিষয় একটানা অনেকক্ষণ পড়া উচিত নয়। এতে পড়ার প্রতি মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। একটি বিষয় এক থেকে দু'ঘণ্টা পড়া যেতে পারে। এর থেকে বেশি হলে পড়ার প্রতি একঘেয়েমি চলে আসে। তাই একটানা কিছুক্ষণ পড়ার পর উঠে একটু হাটাচলা করা যেতে পারে। অথবা গান শুনতে ভালো লাগলে একটু গানও শোনা যেতে পারে। মাইন্ড ফ্রেশ করতে গান বেশ উপযুক্ত। কারওর আবার গল্পের বই পড়তে ভালো লাগে। পড়ার মাঝে একটু গল্পের বই উলটে-পালটে দেখতে পারে। তবে পড়ার একঘেয়েমি কাটাতে যাই করা হোক না কেন সেটা যেন বেশি মাত্রায় না হয়। কিছুটা সময়ের জন্য হতে পারে। কারণ এতে পড়ার প্রতি মনোযোগ নষ্ট হতে পারে।

বিষয়টা একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া: কোনও বিষয় পড়া শুরু করার আগে সেই বিষয়টা আগে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হয়। এরফলে পড়াটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

সঠিক সময় সঠিক বিষয়টা পড়া: পড়ায় মনোযোগ বাড়াতে হলে বা পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে হলে যে বিষয়টা একটু কঠিন বলে মনে হয় সেটা আগে পড়া উচিত। কারণ কম-বেশি প্রত্যেকেরই প্রথমদিকে এনার্জি লেবেল বেশি থাকে। প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও বিষয় একটু একটু ভয় লাগে। কারওর অঙ্ক, কারওর ইংরেজি, কারওর বাংলা। তাই প্রত্যেকে স্টুডেন্টের উচিত তার যে বিষয়টা ভয় লাগে সেটা আগে পড়ে নেওয়া।

মূল্যায়ন করা: কোনও বিষয় পড়া হয়ে গেলে বাবা বা মাকে বা বাড়ির বড়দের কাউকে সেই বিষয়টি থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলা যেতে পারে। সঠিক উত্তর দিতে পারলেই বোঝা যাবে পড়াটা ঠিকঠাক তৈরি হয়েছে। অথবা নিজেরাই প্রশ্ন তৈরি করে না দেখে উত্তর লিখে বড়দের কাউকে দিয়ে চেক করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এই বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখলে পড়ার প্রতি মনোযোগ নষ্ট হবে না। বরং পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। আর পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হলেই মন দিয়ে পড়াশোনা করা যাবে। ফলে পরীক্ষার ফলও ভালো হবে।

দেবাশিস নিয়োগী

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ '**আমার স্কুল**' বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো 'CONTENT FOR AAMAR SCHOOL'
মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট ২০১৭

দুর্গম অমরনাথ যাত্রা

প্রতি বছর কাশ্মীরের অমরনাথ যাত্রায় পূণ্যার্থীদের ভিড় লেগে থাকে। কারণ হিন্দুদের কাছে অমরনাথ একটি পবিত্র তীর্থস্থান বলেই পরিচিত। তবে এই তীর্থস্থানের সঙ্গে রয়েছে মুসলিমদের নিবিড় সম্পর্ক।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থস্থান ভারতশাসিত কাশ্মীরের এই অমরনাথ গুহা। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ দীর্ঘ পাহাড়ি পথ পেরিয়ে খুব কষ্ট করে পৌঁছন ওই গুহায়। চিরকালই এই গুহার আকর্ষণ পূণ্যার্থীদের কাছে আলাদা স্থান পেয়েছে।

কিন্তু হিন্দু পুরাণে বর্ণিত অমরনাথ গুহা প্রায় ৫০০ বছর আগে খুঁজে বের করেছিলেন একজন মুসলিম মেষ পালক।

বুটা মালিক নামের ওই মেষ পালকের পরিবার এখনও প্রতি বছর এই হিন্দু তীর্থযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। তাঁর বংশধরেরা এখনও ওখানেই থাকেন। পহেলগাঁওয়ের কাছে বটকোট নামের একটি গ্রামে।

কিন্তু কীভাবে বুটা মালিক খুঁজে পেয়েছিলেন এই অমরনাথ গুহা? পরিবার সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বুটা মালিক মেষ পালন করতেন। দূরের পাহাড়-পর্বতে ভেড়া-ছাগল চড়াতে যেতেন। সেখানে এক সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দু'জনের মধ্যে নাকি বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেইসময় একবার প্রবল শীতের হাত থেকে বাঁচতে বুটা মালিক একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সঙ্গে ওই সাধুও ছিলেন। ভেতরেও বুটা মালিকের খুব ঠান্ডা লাগছিল। তখন ওই সাধু নাকিবুটা মালিককে একটা কাঙ্গরি দিয়েছিলেন।

কাশ্মীরে শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে মানুষজন একটা ছোট ঝুড়ির মধ্যে কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে ঢোলা পোশাকের ভেতর রেখে দেন। ওই ঝুড়িকেই কাঙ্গরি বলে। সকালবেলায় বুটা দেখেছিলেন যে ওই কাঙ্গরিটা একটা সোনার কাঙ্গরি হয়ে গেছে।

বুটা মালিকের পরিবার থেকে জানা যায়, গুহা থেকে বের হতেই বুটা মালিক দেখেন সামনে অনেক সাধুসন্তের একটা মিছিল চলছে। তাঁরা ভগবান শিবের খোঁজ করছিলেন ওখানে।

বুটা ওই সাধুসন্তদের জানান যে ভগবান শিবের সঙ্গে তাঁর একটু আগেই দেখা হয়েছে গুহার ভেতরে। সাধুদের তিনি গুহায় নিয়ে যান। দেখা যায় বরফের তৈরি এক বিশাল শিবলিঙ্গ রয়েছে, সঙ্গে পার্বতী আর গণেশও আছেন। ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়। সেই থেকে এই যাত্রা চলছে। মাঝখানে অনেক বাধা বিপত্তি এলেও কোনও সময়ে এই যাত্রা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। কিছু কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। যেমন একটা সময়ে বেশ কয়েকজন সাধুসন্ত গুহার পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তখন সেখানকার মহারাজ রঞ্জিত সিং অমরনাথ যাত্রা বন্ধ করে দেন।

কারণ তারা মুসলিম। হিন্দুদের পুজো-পাঠের ব্যাপারে তাঁদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানতেন না। যাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে পাশের গণেশ্বর গ্রাম থেকে কয়েকজন কাশ্মীরি পণ্ডিতকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। তাঁরাই অমরনাথে পুজো চালিয়ে যেতে থাকেন।

এখনও অমরনাথে তিন ধরনের মানুষ বাস করেন— কাশ্মীরি পণ্ডিত, বুটা মালিকের পরিবার আর সাধুসন্তরা।

এঁরাই অমরনাথ যাত্রার সূচনা করেন 'ছড়ি-মুবারক' শোভাযাত্রার মাধ্যমে। যে গ্রামে মালিক পরিবার এখনও থাকেন, পহেলগাঁও এলাকার সেই গ্রামের নামও বুটা মালিকের নাম অনুসারেই 'বটকোট'।

একসময়ে অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটে তাদের গ্রামে পৌঁছতেন। গ্রামের মহিলা, পুরুষ, বাচ্চা— সবাই মিলে তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। ছড়ি-মুবারক শোভাযাত্রা দেখতে গোটা গ্রাম অপেক্ষা করে থাকত। মেয়েরা কাশ্মীরি গান গাইত। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের গুহায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত। আবার গুহা থেকে নেমে তাদের গ্রামে এসে অনুমতি নিয়ে ফিরে যেতেন তীর্থযাত্রীরা। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ কখনওই ছিল না।

হিন্দু তীর্থযাত্রীরা যেহেতু অমরনাথ যাত্রার সময়ে আমিষ খান না, তাই মালিক পরিবারের সদস্যরাও ওই সময়ে মাংস খান না।

অমরনাথ যাত্রা নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় যে আইন পাশ হয়েছে, সেখানেও মালিক পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও কাশ্মীরে গেলেই মালিক পরিবারের কথা স্মরণ করতেন বলে জানা যায়।

তবে একটা আশ্চর্যের বিষয়, বুটা মালিককে সেই সাধু যে কাঙ্গরি দিয়েছিল যেটা পরের দিন সোনার কাঙ্গরি হয়ে গিয়েছিল সেটার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

শোনা যায়, সেই সময়কার রাজারা কাঙ্গরিটা তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে নিয়ে নেন। বহু খুঁজেও পাওয়া যায়নি সেই সোনার কাঙ্গরি। অমরনাথ যাত্রার সময়ে ভক্তদের দান করা অর্থের এক-তৃতীয়াংশ বুটা মালিকের পরিবার পেত।

কিন্তু ২০০২ সালে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড তৈরি হওয়ার পর থেকে তাদের পরিবারকে যাত্রার সবরকম কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তবে তাঁদের পূর্বপুরুষরা ভগবান শিবেরও দর্শন পেয়েছিলেন। অমরনাথ গুহায় পৌঁছনোর যে প্রথম কাঁচা রাস্তাটি ছিল, সেটিও বুটা মালিকই বানিয়েছিলেন। এখনও যাত্রীদের বিনামূল্যে ওষুধপত্র বিলি করতে পরিবারের লোকেরা ওই জায়গায় যায়। যাত্রীরাও পরম্পরা মেনে তাদের বাড়িতে দেখা করতে আসেন। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ঘোড়ায় অথবা ডুলিতে করে কঠিন পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে যান যাঁরা, তাঁরাও সবাই স্থানীয় মুসলিম।